The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ ও আলকাপ: পরিবেশিত বিষয়ের সামাজিক গুরুত্ব

[Traditional Bangla Theatre Sang and Alkap: The Social Significance of Presented Issues]

Md. Tashadul Islam Tareq
PhD Fellow, Department of Theatre, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 06 July 2024
Received in revised: 02 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:

Song, Alkap, Comedy, Society and Performance

ABSTRACT

Traditional Bangla theatre forms, Sang and Alkap, have established a unique place in the history of Bangla theatre by reflecting deep-rooted social and industrial realities. These traditional forms have entertained Bengalis for generations and earned special popularity among the masses as a powerful means of satirizing existing power structures. Through their sharp and often humorous performances, these artists vividly portray scenes of social injustice, inequality, and oppression. The essential characteristics of traditional Bangla theatre are embodied in Sang and Alkap, which continue to remain culturally and politically relevant by mirroring the spirit and struggles of their time. These performances consistently attempt to represent the emerging social crises of their respective eras. The performers of Sang and Alkap do not merely entertain, but also engage critically with the shifting realities of the society around them. Their performances often serve as both artistic expression and subtle resistance. As a result, the themes explored in Sang and Alkap carry considerable social significance, making these traditional forms vital for understanding the cultural discourse and grassroots consciousness of rural Bengal. This research paper is guided by the following specific goal and objectives. The primary goal is to investigate the key social issues portrayed through the traditional performances of Sang and Alkap, and to critically assess the relevance and significance of the themes represented within these unique forms of traditional Bangla theatre. The study also aims to explore how these theatre forms continue to resonate with audiences today and contribute to the preservation of traditional cultural identity.

ভূমিকা

শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাট্যের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের নিরিখে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী। বিশ্ব নাট্যধারায় দৃষ্টি দিলে প্রত্যক্ষ করা যায় অনেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী নাট্য বিকশিত হয়ে মূল ধারার নাট্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় সূচনা পর্ব থেকেই ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের কাহিনি বা অভিনয়রীতির লিখিত কোনো রূপ নেই। এর কাহিনির উদ্ভাবক, কলাকুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক-শ্রোতা সকলেই গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষ। ঐতিহ্যবাহী নাট্য উদ্ভবকাল থেকে সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে রক্ষিত হয়ে নানা ক্রমবিবর্তনের ধারায় কাল পরম্পরায় বর্তমান সময় পর্যন্ত চর্চিত।[১] তাদের চিন্তা-চেতনা, সমাজ-সংস্কৃতি, যাপিত জীবনের নানা দিক ঋতুবৈচিত্র্যের স্পর্শ প্রভাব, ভক্তি-প্রেম প্রভৃতি বিষয় সমাহারে এ নাট্যের কাহিনি নির্মিত হয়। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত জীবন ধারার ঐতিহ্য নির্ভর নানা বিষয়াদি নাট্যকাহিনি ও পরিবেশনারীতির মধ্যে দৃশ্যমান। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ সমাজের নিরক্ষর, সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং স্বল্পশিক্ষিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের সামগ্রিকতাকে আশ্রয় করে নির্মিত। এ নাট্য বংশ ও কাল পরম্পরায় তাঁদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে মুখে মুখে চর্চিত ও পরিবেশিত হয়। গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে বাদ্য, নৃত্য, সঙ্গীত, বর্ণনা ও অভিনয় সহযোগে এই নাট্য পরিবেশিত হয় সাধারণত ভূমিসমতল ও চৌকোণ খোলা মঞ্চে। এ নাট্যের দেহে বহমান থাকে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যময় নানা বিষয়। যা সময়ের আবর্তনে বিবর্তিত হয় এবং নতুন নতুন সংযোজনে ঋদ্ধ হয়। তাই এ নাট্যধারা শাস্ত্রীয় কোনো নিয়ম-নীতি বা সূত্র দ্বারা আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত নয়। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের অন্যতম আঙ্গিক সঙ ও আলকাপ নাট্য। এ নাট্যদ্বয় সাধারণত গ্রাম্যগাঁথা, উপকাহিনি এবং সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। হাস্যরস, ব্যঙ্গাত্মক অঙ্গভঙ্গি, নাটকীয়তার সংমিশ্রণ এবং ভিন্ন মাত্রার সুরের কলাকৌশল প্রয়োগে সঙ ও আলকাপ নাট্য পরিবেশিত হয়।

নৃত্য-গীত-কৌতুকাভিনয়ের সম্মিলনে পরিবেশিত একটি নাট্যধারা সঙ। এ পরিবেশনায় হাস্যরসাত্মক অঙ্গভঙ্গি ও কৌতুকাভিনয়ের প্রাধান্য বেশি থাকে। সঙ বাংলাদেশের টাঙ্গাইলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এছাড়া অদ্যাবধি বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপ এই ধারার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ নাট্যাঙ্গিক দুটির মাধ্যমে কৌতুক, গান, নাচ ও অভিনয়ের এক বিশিষ্ট রঙ্গব্যঙ্গাত্মক চিত্র ফুটে ওঠে। সঙ ও আলকাপ নাট্যের পরিবেশনারীতিতে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এ নাট্যাঙ্গিক দুটির বিষয়বস্তু ও পরিবেশনার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত সমসাময়িক বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে এ নাট্যাঙ্গিদ্বয়ের গল্প-কাহিনি নির্মাণ করা হয়। যেখানে গ্রামীণ সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা বিষয় নিয়ে পরিবেশিত হয় নাট্যাঙ্গিক দুটি। সঙ ও আলকাপের বিষয়বস্তু এবং পরিবেশনার উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য থাকায় বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধে সঙ ও আলকাপ নিয়ে একত্রে আলোচনার নিমিত্তে ‘ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ ও আলকাপ: পরিবেশিত বিষয়ের সামাজিক গুরুত্ব’ বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধটি দ্বারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে প্রত্যাশা করা যায় তা নিম্নরূপ–

১. সঙ ও আলকাপ নাট্যের পরিবেশনায় সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো তুলে ধরা হয় তা অন্বেষণপূর্বক আলোচনা।

২. ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ ও আলকাপের পরিবেশিত বিষয়ের সামাজিক গুরুত্ব উপস্থাপন।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধের তথ্য উপস্থাপন, বিন্যস্তকরণ ও ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং সামাজিক ও নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা মানুষ-নামক প্রাণীটির জন্ম থেকে শুরু করে পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির কথা আলোচনা এবং সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য এবং তার ধর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ নৃ-তত্ত্বের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা (Field Work) পদ্ধতি। গবেষণার মাঠকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ‘অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ’ পদ্ধতি (Participants Observation) অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য সঙ ও আলকাপ গানের কলাকুশলীদের সাথে থেকে সমাজ জীবনে তাঁদের একটি অংশ হয়ে পর্যবেক্ষণ করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যানুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ ও আলকাপের দর্শক, স্থানীয় জনসাধারণ, এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি, শিল্পী ও আয়োজকবৃন্দের নিকট থেকে Focus Group Discussion (FGD) কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা ও নির্বাচিত দল

বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ‘ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য সঙ ও আলকাপ: পরিবেশিত বিষয়ের সামাজিক গুরুত্ব’। প্রবন্ধের সঙ নাট্যের তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করা হয় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার ভজন পালের মহাদেব সঙযাত্রা দলের সঙ পরিবেশনা *কারেন্টে মরা* ও *ট্যাবার বিয়ে* থেকে। আলকাপ নাট্যের তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করা হয় নওগাঁ জেলার অন্তর্গত নিয়ামতপুর উপজেলার সাদাপুর খড়িবাড়ি এলাকায় পরিবেশিত আলকাপ নাট্য *সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী* এবং রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাগমারা উপজেলার রমজান পাড়া গ্রামের মঈনুল সরকারের আলকাপ নাট্য দল কর্তৃক উপস্থাপিত পরিবেশনা *ছোট ভাই ভ্যাজাল* ও *যৌতুক* পরিবেশনা থেকে।

সঙ

নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সার্বজনীন মাধ্যম হলো সঙ। পরে এই রীতি যাবতীয় নাট্যকলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সকল সভ্যতার আদিপর্বগুলোতে সঙের প্রচলনের কথা উল্লেখ করেছেন অনেকে। সঙ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো–অদ্ভুত পোশাকধারী হাস্যকৌতুককারী অভিনেতা, মজাদার সাজগোজ করা লোক।[২] অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ ও মুখভঙ্গির মাধ্যমে ভাব, কার্য এবং পারিপার্শ্বিকতা বর্ণনা করা সঙের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীনকাল থেকে সঙ নানাভাবে বিভিন্ন উৎসব এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতো। দর্শকদের মুগ্ধ করতো যুদ্ধের নৃত্য দেখিয়ে এবং পশু-পাখির ডাকের অনুকরণ করে। এছাড়াও বলিদান সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলো ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করতো। যদিও ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় এই ভঙ্গি অনেক আগেই অভিনয়-কলা রূপে বিকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলো।[৩] গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ‘প্রাচীন গ্রীকগণ কখনও-কখনও সঙের সঙ্গে সমবেত সংগীত যুক্ত করে

দিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কেবল দেবতা ও বীরপুরুষ সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে সঙের অভিনয় হতো।'[৪] যদিও তখনকার রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সমকালীন নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে গ্রীসে ও রোমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মকভাবে অভিনয় উপস্থাপন করা হতো। উল্লেখ্য যে, রোমের নাট্যরীতিতে সঙ সংজ্ঞাটি মঞ্চাভিনয় এবং অভিনেতা উভয়েরই সম্পর্কে ব্যবহৃত হতো। নাট্যাভিনয়ে যখন কেনো অভিনেতা অঙ্গভঙ্গি করে ভাব প্রকাশ করতেন তখন সেই বিশেষ অভিনয়টুকুকে সঙ বলা হতো। গবেষক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আরো উল্লেখ করেন–

> বিলাতী রঙ্গমঞ্চের উপর সঙের অভিনয় বস্তুতঃ এক হাসি ঠাট্টা ও রঙ্গ রূপে প্রচলিত ছিলো। এই সঙ নাচ, গান, দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছেদের বহু বিচিত্র সমারোহে অভিনীত হতো এবং অভিনয়ের কিছুটা ইতালীয় মুখোশ রঙ্গনাট্য (Masked Comedy) থেকে পরিগৃহীত কয়েকটি প্রচলিত চরিত্র অবলম্বনে পরিস্ফূট হত।[৫]

সঙের (Pantomime) পরবর্তী বিকাশ *Comedia dell arte* এবং তা থেকে *Herliquin* উদ্ভুত হয়।[৬] Herliquin-এক প্রকার বিলাতী সঙের অভিনয়। সেখানে রঙ-বেরঙের পোশাক পরিধান করে পরিবেশন করা হতো নানারূপ রঙ্গকৌশল। Herliquin-এ নাচ গানের থেকে হাস্যরসাত্মক অঙ্গভঙ্গি, সংলাপ অর্থাৎ মস্করা বেশি পরিবেশনা করা হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা উৎসবে ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই সঙ আত্মপ্রকাশ করতো তার বহু প্রমাণ লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ চরিত্র বের করার রীতি অনেক পুরোনো। গবেষকদের মতে, প্রাচীনকালে শিব বিষয়ক উৎসব ও কৃত্যের ধারায় এদেশে সঙসহ অসংখ্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের উদ্ভব হয়েছে।[৭] শিব লৌকিক অনার্য দেবতা হিসেবেই প্রাচীন বঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। জাতি-উপজাতি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই লৌকিক দেবতার সর্বব্যপকতা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলার সর্বত্র শিবের প্রভাব বিদ্যমান। দৃষ্টান্তসরূপ উল্লেখ করা যায়, নাথ সম্প্রদায়, ধর্মমূলক সম্প্রদায়, কৃষিজীবী কোচ উপজাতি ও পরে নানান আঞ্চলিক দেবতার রূপকল্পে, ব্রত, আচার, কৃষি–কৃত্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই। সেলিম আল দীন তাঁর *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

> শিবের ধ্যানমগ্নতা, প্রণয়, বিবাহ, অভিমান, ক্রোধ, ভিক্ষাপ্রবণরূপ, কৃষিকর্ম, আত্মমগ্ন-ঔদাসীন্য, নৃত্য ও নাট্যপ্রিয়তা প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি মানসে অদ্বিতীয় প্রভাব বিস্তার করে আছে। শিবোৎসব যা শিবের গাজনে অনুষ্ঠিত নানারূপ কৃত্যে নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হয়।...শিব-পত্নী গৌরীর শঙ্খ পরিধান ও শিবের শাঁখারী সাজা নিয়েও নানা ধরনের গীতাভিনয় গাজন উপলক্ষে প্রচলিত রয়েছে।[৮]

বাংলায় শৈবদের সংখ্যা খুব কম ছিলো না। লোক মুখে প্রচলিত আছে এই শিব ভক্তগণ চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিবের আরাধনা করে আড়ম্বরের সঙ্গে। দুই ধরনের ভক্ত বা সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। যারা চৈত্র মাসে শিবের সাধনা করে তাঁদের বলা হয় শিব সন্ন্যাসী। আর যারা বৈশাখ মাসে সাধনা করে তাঁদের বলা হয় ধর্ম সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীরা নানারকম সঙ সেজে ঘুরে বেড়াতো গাজনের সময়। চৈত্রসংক্রান্তির দিন গাজনের দল ঢাক, ঢোল, কাঁসি নিয়ে পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করতো। সেখানে সঙ মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকতো।[৯] সঙ প্রসঙ্গে গবেষক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গৌড় বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হচ্ছে গত কয়েক শত বছর ধরে প্রচলিত চিত্তবিনোদনের ধারা সঙ।'[১০] ছদ্মবেশ[১১] অর্থে সঙ শব্দটি বাংলাদেশে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। এদেশে জাত বা যাত্রা অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় সঙ সেজে যাওয়ার এক ধরনের বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিলো। যদিও উনিশ শতকের শুরু থেকে চড়ক গাজন অনুষ্ঠানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানা প্রকার চরিত্র সঙের মাধ্যমে প্রকাশ করা একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সঙ অকারণ অঙ্গ-ভঙ্গি করে বা কখনও গান গেয়ে কিংবা ছড়া কেটে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিতো।

চৈত্র সংক্রান্তির পরের দিন পয়লা বৈশাখ অজ্ঞাত ভবিষ্যতকে সানন্দে বরণ করতে সঙের খেলায় মেতে উঠতো সর্বস্তরের বাঙালি। মুখে নানা রঙ মেখে, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে এই সঙের শোভাযাত্রা বের হতো দ্বিপ্রহরে। গাজনের ভক্তদের মধ্য থেকে দু'জনকে শিব ও দুর্গা সাজানো হতো। এছাড়াও শোভাযাত্রায় অন্য ভক্তরা নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতির সঙ সেজে নৃত্যের মাধ্যমে পৌরাণিক কোনো দৃশ্য উপস্থাপন করতো এবং শিবের নানা লৌকিক ছড়া গানও পরিবেশন করতো।[১২] এলাকার শিবমন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে এ সকল শোভাযাত্রা পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রদক্ষিণ করে শেষে আবার ফিরে আসত মন্দিরে। সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হতো কৃত্যানুষ্ঠান ও মুখোশ নৃত্য। রাতভর এ অনুষ্ঠান চলত। প্রাচীন কালের এ সকল অভিনয় উপস্থাপনার অবশিষ্টাংশ বর্তমান সময়েও শিবের গাজন, নীলের গাজন, সঙ, অষ্টক যাত্রা ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কালে সঙের যে পরিবেশনা বিভিন্ন শোভাযাত্রায় পরিলক্ষিত হয় তা ছিলো মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। যারা শিব সাধনা করতো তাদের মধ্য থেকেই সঙ সেজে নৃত্য করে শিবের গুণ-কীর্তন পরিবেশন করা হতো। সঙের পোশাক, রূপসজ্জা ও নৃত্যের ভঙ্গিগুলো এমন ছিলো যে অনেকটা ব্যঙ্গাত্মক যা দেখে উপস্থিত দর্শকগণের হাসির উদ্রেক হতো। গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ উল্লেখ করেন, 'সঙ নাট্যরীতির অস্তিত্ব হতে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের বাংলায় কৌতুক গান, নাচ ও

অভিনয়রীতির এক বিশিষ্ট রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিলো।'[১৩] বর্তমানে হাস্যরসাত্মক পরিবেশনা সঙ নাট্যাঙ্গিক প্রায় বিলুপ্তির পথে, তবুও সুপ্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে এটি গ্রামীণ জনপদে অল্প পরিসরে এখনও টিকে আছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিবের গাজন অনুষ্ঠানে সঙ সেজে নৃত্যের মাধ্যমে যে পৌরাণিক দৃশ্য এবং শিবের নানারকম লৌকিক ছড়া গান পরিবেশন করা হতো তা মূলত জনপ্রিয় কৌতুক গান ও নাচেরই আওতাভুক্ত। সেখান থেকেই সঙ নাট্যরীতির উদ্ভব হয়। পনের শতকের পূর্ব সময়ে শোভাযাত্রা, বিভিন্ন মেলা-উৎসাবাদিতে সঙ চরিত্রটি ব্যাঙ্গাত্মক অভিনয় উপস্থাপন করতো। উনিশ শতকের শুরু থেকে সঙ অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের চিত্রগুলো তুলে ধরা শুরু করে। সঙ যখন গান গাইতো, নাচতো এবং বিভিন্ন উপহাসমূলক কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করতো তখন একদল বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ তাকে সহযোগিতা করতো। এখান থেকেই সঙ বিচিত্র কাহিনির সমন্বয়ে কাঠামোবদ্ধ স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক হিসেবে উন্মোচিত হতে থাকে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে সঙ-এর অভিনয় জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনপ্রিয়তার প্রভাব এতোটাই বেড়ে যায় যে, তা পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে, বিভিন্ন সময়ে নানারকম পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে সঙ বের হতে থাকে, এছাড়াও বিয়ে বাড়িতে আনন্দ অনুষ্ঠান পালনের জন্য সঙের পরিবেশনা উপস্থাপন শুরু করা হয়। লোকসংস্কৃতি গবেষক সাইমন জাকারিয়া উল্লেখ করেন, আমোদ-প্রমোদ যেমন হতো, সেই সঙ্গে অনেক সময় সঙের হাস্য কৌতুক হতো।[১৪] এছাড়াও উনিশ শতকে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যাত্রার পরিচালকেরা সঙ চরিত্রটি যাত্রার দুই কৌতুক অঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে ব্যবহার করা শুরু করে। কারণ, যাতে করে যাত্রার জনপ্রিয়তা দর্শকের নিকট অধিক গ্রহণীয় হয়। সৈয়দ জামিল আহমেদ উল্লেখ করেন, উনিশ শতকীয় যাত্রানুষ্ঠানে আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংযোজন হলো সঙ বা ভাঁড় চরিত্রের উপস্থাপনা। এসব সঙেরা বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করতো, তবে তাদের ভাঁড়ামো ছিলো কিছুটা স্থূল প্রকৃতির।[১৫] বলা যায়, সঙ নাট্যাঙ্গিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে শুধুমাত্র জনগণকে হাস্যরসাত্মক বিনোদন দেয়ার জন্য।

সঙ নাট্য উদ্ভব ও বিকাশের ধারায় বর্তমান সময়ে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সঙের বিষয়বস্তু ও পরিবেশনারীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিবের গাজন উৎসবে সঙ চরিত্রটি যে রূপে ছিলো তা সময়ের আবর্তনে বর্তমান রূপে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার ক্রমোন্নতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সঙ পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশের বিভিন্ন স্থানে সঙকে পেশা হিসেবে নিয়ে অসংখ্য ছোট-বড় দল গড়ে উঠেছিলো। যারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসব, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানাদিতে অর্থের বিনিময়ে নানারকম ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে সঙ উপস্থাপন করতো।

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যধারার অন্যতম একটি স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক *সঙ*। যাকে স্থানীয়ভাবে *সঙযাত্রা* এবং *সঙখেলা* নামেও অভিহিত করা হয়। সঙ মূলত সামাজিক নকশাধর্মী এক ধরনের হাস্যরসাত্মক বা ব্যাঙ্গত্মক নাট্যাভিনয়রীতি। যেখানে সংলাপাত্মক আঙ্গিক অভিনয়ের আশ্রয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয় সমসাময়িক সামাজিক অসঙ্গতিগুলো। সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে এ নাট্যাঙ্গিকের গল্প-কাহিনি নির্মাণ করা হয়। যেখানে কৃষক তথা খেটে খাওয়া মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। সঙ নাট্যরীতিটি কৌতুক, গান, নাচ ও অভিনয়ের একটি বিশিষ্ট রঙ্গব্যঙ্গাত্মক চিত্র। এটি মূখ্যত সংলাত্মক চরিত্রাভিনয়রীতি হলেও পরিবেশনায় দেখা যায় জোকার-অভিনেতারা হাত-পা ছুড়ে দেহ বাঁকিয়ে বিশেষ প্রকারের নৃত্য উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এ নাট্যরীতির পরিবেশনা দেখা যায়। বিশেষ করে টাঙ্গাইল জেলায় সঙের প্রচলন বেশি ছিলো।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ শিল্পীরা কোনো একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ নয়। তারা সকল ধম্বালম্বী জনগোষ্ঠী থেকেই সঙশিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিশেষত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগণই বেশি সঙের সাথে যুক্ত। বলা যেতে পারে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ যেমন কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর, শিক্ষক–এককথায় সকল পেশাজীবি জনগোষ্ঠীর মানুষই এই নাট্যধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন।[১৬] সঙ শিল্পীরা যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের নন সুতরাং তাদের ধর্মীয় কেনো এককেন্দ্রিকতা নেই। এই শিল্পীরা সমাজের আলাদা কেনো শ্রেণির ব্যক্তিও নন তাই সঙ শিল্পীদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কোনো ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। বিনোদন প্রিয় সাধারণ মানুষ তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া পরিচিত বিষয় নিয়ে রচিত নৃত্য, গীত বাদ্য সমৃদ্ধ হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক নাট্যপালার শৈল্পিক চরিত্রভিনয়কেই সঙ যাত্রা নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

সঙ যাত্রার নির্দিষ্ট কোনো পাণ্ডুলিপি থাকে না। সঙদলের ম্যানেজার ও অন্যান্য শিল্পীরা একত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সঙের কাহিনি, গান ও সংলাপ তৈরি করে থাকেন। সমসাময়িক ঘটনাকে উপজীব্য করে হাস্য ও আদিরসের সমন্বয়ে তৈরি হয় সঙের কাহিনি। একটি কাহিনির মধ্যে একটি সঙ-এর সমাপ্তির ঘটে। কাহিনিও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দুটো, তিনটা কিংবা চারটা দৃশ্যের মধ্যেই একটি সঙ-এর পরিসমাপ্তি হয়। সঙের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো জোকার। প্রত্যেকটি সঙের দলে একাধিক জোকারও থাকে। গান, নৃত্য এবং অভিনয় এই তিনটি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী শিল্পীগণই সঙের জোকার

হওয়ার যোগ্যতা রাখে। জোকারের পাশাপাশি থাকে দুজন নারী চরিত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরুষরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। অর্থাৎ পুরুষরাই নারী সেজে উপস্থাপন করেন গান, নৃত্য এবং অভিনয়। জোকার ও নারী চরিত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দু-তিনজন পার্শ্ব চরিত্র থাকে।[১৭]

বক্ষ্যমাণ গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণকৃত সঙ পালাগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সঙ-এর পরিবেশনায় মূল চারটি অংশ থাকে। অর্থাৎ সঙের পরিবেশনারীতিতে চারটি অংশ বিদ্যমান। পরিবেশনার ক্রমঅনুযায়ী অংশগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

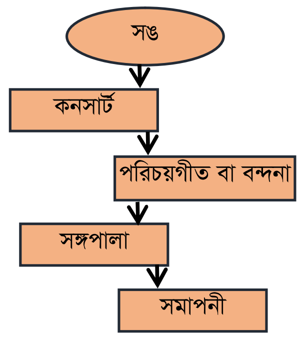

চিত্র ০১: সঙ-এর পরিবেশনারীতি

সঙ পরিবেশনার শুরুতে বাদ্যযন্ত্রীদের কনসার্ট শুরু হয়। মূলত দর্শকদের মনোযোগী, শৃঙ্খলিত এবং আগ্রহী করে তোলার জন্য এই কনসার্ট উপস্থাপন করা হয়।[১৮] কনসার্টসহ পুরো সঙ পরিবেশনায় যে বাদ্যযন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে অন্যতম হলো–বাঁশের বাঁশি, খোল, করতাল, ঢোল, হারমোনিয়াম এবং কর্নেট। কনসার্টে জনপ্রিয় সব গানের যন্ত্রসঙ্গীত উপস্থাপন করা হয়। যে গানগুলোতে ঐ সময়ের দর্শক নিজেকে খুব বেশি সংযোগ করতে পারে।

সঙ-পরিবেশনায় পরিচয়গীত বা বন্দনা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশে যেসকল সঙদল সঙ পরিবেশনা করে থাকে তাদের প্রত্যেক দলের পরিচয় গীত বা বন্দনা প্রায় একই ধরনের। পরিচয় গীতে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো–পরিবেশিত সঙযাত্রার নাম, দলের নাম, ম্যানেজারের নাম, শিল্পীদের নাম এবং কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে সেই নামগুলো। বিশেষ করে যখন জোকারের নাম উপস্থাপন করা হয় তখন দর্শক জোকারকে উল্লসিতভাবে সম্ভাষণ জানায়। অনেক সময় লক্ষ করা যায় পরিচয় গীত বা বন্দনার পরে অনেক দলে বন্দনা গীত নামে আরেকটি অংশ গাওয়া হয়। যেখানে বন্দনা গীতের মূল পয়ারটির সঙ্গে পূর্বে ভানুশ্বর, পশ্চিমে–মক্কা পাক স্থান, উত্তরে–হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে–ক্ষীর নদী সাগর ও ওস্তাদের নাম বন্দনা করে থাকে। বন্দনাগীতের মূল পয়ারটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–'করি দুনিয়া বন্দনা/ঘরের মানুষ ভালা না হইলে/সংসারই চলে না/করি দুনিয়া বন্দনা।'[১৯] উল্লেখিত বন্দনাগীত শেষ হলে সঙ পালার নাম ঘোষণা হয়। সঙের নাম ঘোষণা হওয়ার পর সঙের গান গেয়ে শুরু করা হয় পালার অভিনয়। অনেক দল একেকটি আসরে একাধিক পালা প্রদর্শন করে থাকে। পালার সংখ্যা নির্ভর করে আয়োজকদের সময় এবং অর্থের উপর। পরিবেশিত সঙ পালা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এ অঞ্চলের সঙ অভিনেতাগণ তাদের অঞ্চলের নিজস্ব রীতি ও পদ্ধতি মেনেই সঙ পরিবেশনা করে থাকে। সঙ নাট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তবুও তারা দারিদ্র, অসহায়তা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে পেছনে ফেলে যাপিত জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আনন্দে ভরিয়ে তোলে। সমাজ ও সামাজিকগণের চিত্তে সাময়িক আনন্দ সঞ্চার এবং নিজেদের দারিদ্রের কষ্টকে ভুলে থাকার জন্যই তারা অস্বাভাবিক স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়।

সঙ যাত্রা মৌখিক রীতিতে সৃষ্ট নাট্য আঙ্গিক, যা বৃহত্তর লোকসমাজের ঘটনা বা কাহিনি অঙ্গীকরণপূর্বক অতিরিক্ত জাঁকজমকপূর্ণ রং ঢং ও হাস্যতামাশার মধ্য দিয়ে প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাহিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় সঙ যাত্রায়ও সমকালীন জীবন ভাবনা ও সমাজ অর্থনীতির বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে অভিনেতার ব্যক্তি রুচির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। টাঙ্গাইল অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত সঙ পালাগুলো হলো- 'ফোরটুয়েন্টি', 'বউ-শাশুড়ির ঝগড়া', 'বিয়া বিয়া', 'ঢাহা যামু', 'ফুটানি', 'ঘোড়ার আন্ডা' প্রভৃতি। সঙ এর কাহিনি এবং পরিবেশনার আনুষাঙ্গিক সবকিছুই মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে পরিবেশিত টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার বেতডুবা গ্রামের ভজন পালের মহাদেব সঙযাত্রা দলের পরিবেশনা *ট্যাবার বিয়েতে* লক্ষ্য করা যায় সমাজের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি। পরিবেশনায় উপস্থাপিত প্রত্যেকটি অংশই অতিরিক্ত মাত্রার বিনোদন এবং রং ঢংয়ে পরিপূর্ণ।

ছেলে: বাবা, বাবা গো, আমি যামু না।
ছেলের বাবা: কি অইছে বিয়াই, আপনার মাইয়া এবা করে ক্যান?

মেয়ের বাবা: আপনের পোলা যে এরকম ন্যাংড়া তা আগে কন নাই ক্যা?

ছেলের বাবা: আপনেকে তো আগেই বলছি পোলা আমার এক পায়ে খাড়া। আপনের মাইয়া যে বোবা তা আগে বলেন নাই কেনো?

মেয়ের বাবা: আমিও তো আগেই বলছি মাইয়া আমার মুখে কোনো কথা নাই।[২০]

উপরোক্ত সংলাপের মাধ্যমে দুই অভিভাবকের কথার যুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশ ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেই সমাজে প্রচলিত ঘটনার উপমা দিয়েছেন। কিন্তু সেটা যে উপমা নয় বরং সত্য প্রকাশ করেছেন সেটা বোঝা যায়নি। যেমন 'পোলা আমার এক পায়ে খাড়া' এই বাক্যের অর্থপ্রচলিত দাঁড়ায় ছেলে প্রচণ্ড রকমের আগ্রহী। অন্যদিকে 'পোলা আমার এক পায়ে খাড়া' এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় ছেলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্য পায়ে সমস্যা। দর্শকের সম্মুখে যখন এরকম হাস্যরসাত্মক সংলাপ উপস্থান করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের আকর্ষণ বেড়ে যায় ঘটনার প্রতি। সঙ পালার প্রতিটি অংশেই এমন হাস্যরসাত্মক ঘটনা এবং ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র উপস্থাপনা করা হয়।

ছেলে: ও মা। অহন আমি বিয়া টিয়া করমু না।

মা: ক্যা তুই বিয়া করবি না ক্যা? তুই কি আমার দুঃখ বুঝস না? আমি যে একলা একলা বাড়িতে থাকি।

বাবা: বাবারে তুই রাজি হ, তুই দেহস না তোর মা কেমন বুড়ি হইয়া গেছে।

মা: বাবারে তুই তাড়াতাড়ি একটু রাজি হ।

ছেলে: আমি তোমাওে বাবার মা কই তাও আমি বিয়া করমু না।

মা: এই যে! তোমার ছেলেরে বুজাও।

বাবা: বাবা রে! তুই বুঝস না তোর মা বুড়ি অইছে অহন বিয়া না করলে তোর মা তো মইরা যাইবো।[২১]

সঙ পরিবেশনায় মূলত সঙ শিল্পীরা বিভিন্ন ঘটনাবলীকে হাস্যরসাত্মক ও ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করে। এ নাট্যাঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো হাস্যরসাত্মক শারিরীক কসরত ও কৌতুক অভিনয় দেখিয়ে দর্শকদের বিনোদন দেয়া। এই বিনোদনের মধ্যে লোকশিক্ষাও থাকে। যা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনাবোধ সৃষ্টি ও সুন্দর সমাজ গঠনের প্রত্যয়েই উপস্থাপন করা হয়। উপরিল্লিখত সংলাপে লক্ষ্য করা যায়, বাবা-মা তাদের ছেলেকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করছে কিন্তু ছেলে রাজি হচ্ছেনা। বাবা তার ছেলেকে পরিবারের পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলছে তার মায়ের বয়স হয়েছে এখন ঘরে পুত্রবধু আসলে মায়ের একাকিত্ব দূর হবে এবং ছেলের বউকে দেখতে পারবে। তাই সে যেনো দ্রুত বিয়েতে রাজি হয়। সমাজে পারিবারিক বন্ধন এবং যৌথ পরিবারের চিন্তা কিন্তু এখনও লক্ষ্য করা যায়। তারই কিছুটা ইঙ্গিত এই পরিবেশনায় পাওয়া যায়। যদিও সঙ পরিবেশনায় ছেলে (জোকার চরিত্র) অত্যন্ত বোকা স্বভাবের হয়ে থাকে। জোকার চরিত্র অতিমাত্রার হাস্যরসাত্মক শারিরীক কসরত এবং কৌতুকাভিনয় উপস্থাপন করে থাকে। যদিও হাস্যরসাত্মক শারিরীক কসরত এবং কৌতুকাভিনয় উপস্থাপন ভঙ্গিই সঙের অন্যতম উপাদান। সঙ পরিবেশনার সাথে ইতালির পরিবেশনা কমেডিয়া দেল আর্তের এক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য ইতালিতে পেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো এক শ্রেণির কমিক দল, যা 'কমেডিয়া দেল আর্তে' নামে পরিচিত। এই কমিক দল বিভিন্ন স্থানে দর্শকের উপস্থিতিতে হাস্যরসাত্মক শারিরীক অঙ্গভঙ্গি ও কৌতুক অভিনয় প্রদর্শন করতো।[২২]

সঙের আঙ্গিক ও গঠনগত কাঠামোতে সেই পুরাতন ঐতিহ্য বিদ্যমান থাকলেও বিষয়বস্তু ও পরিবেশনারীতির দিক থেকে বর্তমানের সঙ অনেকটাই পরিবর্তিত। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির আধুনিকায়নে জনসাধারণের বিনোদন গ্রহণের মানুষিকতার পরিবর্তন হচ্ছে যার ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকগুলো একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। উল্লেখ্য যে, সঙ পরিবেশনার সংখ্যা এবং একইসঙ্গে সঙের দল ও সঙ শিল্পীবৃন্দের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে আশার বাণী যে, এখনও টাঙ্গাইল জেলায় বেশকয়েকটি দলের সন্ধান পাওয়া যায় যারা এখন বিভিন্ন উৎসব ও বিশেষ দিবসে সঙ যাত্রা পরিবেশিত করে থাকে। সঙযাত্রায় সমকালীন জীবন ভাবনা ও সমাজ অর্থনীতির নানা অভিজ্ঞতার আলোকে অভিনেতাগণ তাদের রুচির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন এবং সচেতনতাবোধ তৈরি করেন সাধারণ মানুষের মাঝে। সঙ যাত্রার পরিবেশনা সমকাল ও সমাজনির্ভর বিধায় হাজার বছরের বাংলা নাট্যের বিচাওে অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের চেয়ে এর উপস্থাপন শৈলী ভিন্নতর।

আলকাপ

ঐতিহ্যবাহী নাট্য আলকাপ বাংলাদেশের বরেন্দ্র (রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ) অঞ্চলে প্রচলিত। তবে এই নাট্যাঙ্গিকের আদিভূমি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ-মুর্শিদাবাদ। এছাড়াও রাঢ় বাংলার বীরভূমেও আলকাপ নাট্য প্রচলিত রয়েছে। এজন্য আলকাপ দুই বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঐতিহ্যবাহী এই নাট্যাঙ্গিক মালদহ ও মুর্শিদাবাদে আলকাপ নামে পরিচিত হলেও রাঢ়ে 'ছিচর' বা 'ছ্যাচড়া' নামে পরিচিত।[২৩] বাংলাদেশের রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার অধিকাংশ স্থানে বর্তমান

সময়েও বিভিন্ন উৎসব ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে এ নাট্য পরিবেশিত হয়। সামাজিক, পৌরাণিক, রূপকথা আশ্রয়ী নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনেকটা হাস্যরসাত্মক আবহে পরিবেশিত হয় আলকাপের কাহিনি। গ্রামীণ সামাজের অক্ষরজ্ঞানহীন এবং সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আলকাপ নাট্য চর্চা করে থাকে। তাই এ গানের দর্শক গ্রামীণ সমাজের সাধারণ ব্যক্তি, কৃষক, দিনমজুর, মাঝি-মাল্লারা হয়ে থাকে। এই শ্রেণির দর্শকরাই এ নাট্য পরিবেশনা উপভোগ করার পরে নিজের ইচ্ছে মতো মনের আনন্দে গেয়ে থাকে এবং শখের বসে চর্চাও করে থাকে। তাই অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাঙ্গিকের মতো আলকাপও স্বতন্ত্র এক নাট্যাঙ্গিক। সবুজ-শ্যামল এই অপরূপ দেশের হাস্য-রসিকতা প্রিয় বাঙালি সমাজে আলকাপের প্রহসনধর্মী পরিবেশনা আজও অনেকের কাছে গ্রহণীয় ও প্রশংসিত। আলোচনার প্রারম্ভে *আলকাপ* শব্দের আভিধানিক অর্থ ও প্রচলিত অর্থগত তাৎপর্য নির্ণয় আবশ্যক বলে গবেষক মনে করে। কারণ, আলকাপের উদ্ভব এবং শব্দটির আভিধানিক অর্থ নির্দিষ্টকরণে মতভেদ বিদ্যমান।

আলকাপ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- আল অর্থ *হুল* এবং কাপ অর্থ *কৌতুক* বা *প্রহসন*। অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক একপ্রকার প্রতিবাদী নাট্য পরিবেশন রীতি হলো আলকাপ। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের সমালোচক গৌরিশংকর ভট্টাচার্য বলেন, 'আলকাপ হলো নানাপ্রকার কাহিনি ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশ মূলক পালাগান। আলকাপের কাপ অংশটি রঙ্গরসের কৌতুকের দ্যোতক।'[২৪] সমালোচক হরিপদ চক্রবর্তী আলকাপের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন– বিভিন্ন অর্থে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, দেশি সব ভাষাতেই *আল* শব্দ পাওয়া যায়। আরবি *আল* মানে মস্তান, ফারসি অর্থ লাল রং, সীসা ও মদ্য, বাংলা মানে হুল, কীলক, কন্টক, বেড়া ইত্যাদি। *কাপ* কথাটির অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাশা, সঙ। আল ও কাপ দুটি মিলে সূক্ষ্ম তামাশা, ধারালো কৌতুক, রঙ্গ, ব্যঙ্গ অর্থ পাওয়া যায়।[২৫] নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্যগুণ সম্পন্ন অভিনয়ের সমন্বয়ে আলকাপ পরিবেশিত হয়। গবেষক মহ: নুরুল ইসলামের মতে, 'আঙ্গিক, উপস্থাপন রীতি, বিষয়বস্তু সাধারণের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ও গ্রহণীয়। সাধারণ মানুষের শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, আনন্দ-বেদনার কথা ও হাসি-ঠাট্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপভাবে পরিবেশিত হয়। কখনও তা পরোক্ষভাবে আবার কখনও স্পষ্ট ও সরাসরিভাবে আসরস্থ হয়।'[২৬] কোনো কোনো গবেষকের মতে আলকাপ শব্দটি আরবি শব্দজাত। যার অর্থ মস্করা বা কৌতুক।[২৭] *বঙ্গীয় সংস্কৃতি কোষ* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে আলকাপ হলো রঙ্গরসিকতা বা হাল্কা হাসি ঠাট্টার প্রহসন। উক্ত গ্রন্থে *কাপ* অর্থ কাপট্য *আল* অর্থ স্থূল সুতরাং আল ও কাপের সমন্বয়ে বলা হয় বিদ্রুপাত্মক রঙ্গধর্মী নকশা।[২৮] আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন আলকাপ শব্দটি দ্বারা সামাজিক ব্যঙ্গ বোঝায়। তাঁর মতে আলকাপ শব্দটি সম্ভবত আরবি ভাষা থেকে গৃহীত।[২৯] অন্যত্র ফণী পাল আলকাপ শব্দটির অর্থ উল্লেখ করেছেন নতুন মস্করা বা তামাসা। মুসলমানদের দ্বারা শব্দটি বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ বলেও তিনি মনে করেন।

উপরিউল্লিখিত আলোচনাগুলো থেকে সহজেই ধারণা করা যায়, আলকাপ শব্দের যতগুলো অর্থ করা হয়েছে তা প্রায় অভিন্ন। কারণ হাস্যরসাত্মক, রঙ্গরসিকতা, ব্যঙ্গাত্মক, বিদ্রুপাত্মক, মস্করা, তামাসা এবং প্রহসন ইত্যাদি শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ সামান্য ভিন্ন হলেও ভাবগত অর্থ প্রায় অভিন্ন। এক্ষেত্রে সকল গবেষকগণের অভিমত থেকে বলা যায়, গ্রামীণ সমাজের রঙ্গরসিকতাপূর্ণ ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক প্রহসনধর্মী নাট্য হচ্ছে আলকাপ। যেখানে হাসি-ঠাট্টা ও মস্করার অন্তরালে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গি এবং সংলাপে সমাজ ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি সম্পর্কে উপস্থিত দর্শককে সচেতন করে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়। আলকাপ সমাজে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত নানা বিভেদ প্রবণতাকে দূর করে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। ফোকলোর গবেষক অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী উল্লেখ করেন–

> *আল* শব্দের একটা অর্থ আছে সেটি হচ্ছে *পিন* যা দিয়ে আমরা কাউকে খোঁচা দেই। *আল* শব্দটি এই অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। সেটি হচ্ছে গরু বা মহিষকে তাড়ানোর জন্য যে লাঠিটি ব্যবহার করা হয় তার মাথায় একটা আল লাগানো থাকে পিনের মতো। আর *কাপ* শব্দটা *কৌতুক* বা *রঙ্গরস* অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা যায় আলকাপ হচ্ছে কাউকে খোঁচানো এবং সেটা রঙ্গরসের মাধ্যমে। এই খোঁচানোটা সবসময় নেগেটিভ অর্থে তা কিন্তু না। কোনো বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য বা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার জন্য মোটকথা সত্যে পৌঁছানোর জন্য এক প্রকার তর্ক করা হয়। আর এই তর্কের মধ্যে তদন্ত থাকে, মীমাংসা বা বিচার থাকে। এই মীমাংসা বা বিচারের মাধ্যমে আমরা যেকোনো সত্যে পৌঁছাতে পারি।[৩০]

একজনের প্রশ্নের পিঠে উত্তর দিয়ে খোঁচা মেরে প্রশ্ন করতে-করতে এগিয়ে যায় একটি ঠাট্টার গল্প। যে গল্পের শেষে এক ধরনের মীমাংসা বা সমাধান থাকে। এই গল্পকেই গ্রামের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ আলকাপ হিসেবে উল্লেখ করেন। আলকাপ নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। পরিবেশনার মধ্যেই নির্ধারিত বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মধ্যে মঙ্গলজনক সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়। যাতে খুব সহজেই প্রত্যেকে বুঝতে পারে সমস্যা থেকে সমাধানের পথ কোনটি হলে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের উপকার হবে। প্রতিনিয়ত সমাজের সাধারণ মানুষ যে সমস্যাগুলোর মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে আলকাপ নাট্যের বিষয়বস্তুতে সেই বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়ে হাস্যরসাত্মক কাহিনি উপস্থাপন করা হয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আলকাপ নাট্য পূর্ণতা লাভ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'নবাবগঞ্জ সাময়িকী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট লেখক এবং গবেষক মহসীন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, ১৮৪৮ সালের দিকে

ভবতারণ নামের জনৈক ব্যক্তি বর্তমান আঙ্গিকের আলকাপ গানের প্রবর্তন করেন। ভবতরণের বাড়ি অবিভক্ত বাংলার মালদহ জেলার মোনাকষা গ্রামে।[৩১] এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় বাংলা ১৩৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে। এতে বলা হয়েছে 'প্রায় একশ বছর আগে মালদহের মোনাকষার ভবতরণ সরকার আলকাপের সূচনা করেন। তাঁর শিষ্য ছিলেন বোনাকানা। এই বোনাকানার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন জঙ্গীপুরের হাসুপুর গ্রামের বসন্ত সরকার। মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত আলকাপওয়ালা ঝাঁকসু সরকার ছিলেন বসন্ত সরকারের শিষ্য।[৩২] আবার ভিন্নমতেও বলা হয় যে, বোনাকানা নয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পৌর এলাকার রাজারামপুর গ্রামের মরহুম জামুরুদ্দিন বিশ্বাস (১৮৫৭-১৯৫২) সরকারই সর্বপ্রথম বন্দনা, ছড়া, ফার্স, খ্যামটা ও পালা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ আলকাপের প্রচলন করেন।[৩৩] বর্তমানে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে আলকাপের যে রীতি প্রচলিত আছে তা উনিশ শতকের পঞ্চাশ দশকের বিকশিত অবস্থারই ফলাফল। বোনাকানার পর থেকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে যারা আলকাপ চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের একশত সাতচল্লিশ জনের একটি তালিকা পাওয়া যায় মাযহারুল ইসলাম তরুর *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত: আলকাপ* গ্রন্থে।[৩৪] যদিও এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ। তবুও দীর্ঘ এই তালিকা থেকে বলা যায় রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে আলকাপ ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিলো।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ১০-১৫ ফিট গোলাকার স্থানে মাটি দিয়ে সামান্য উঁচু করে আলকাপ নাট্য পরিবেশনার মঞ্চ প্রস্তুত করা হতো। এছাড়াও পরিবেশনার সময় উক্ত গোলাকার মঞ্চের উপর কাপড় দিয়ে টাঙ্গানো হতো ছাউনি। যদিও বর্তমান সময়ে কোথাও এরকম কোনো স্থায়ী আলকাপ মঞ্চ নেই। আয়োজকবৃন্দ যেখানে স্থান দেন সেখানেই আলকাপ নাট্যের আসর উপস্থাপন করে থাকে। তবে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং উৎসবাদিতে ফাঁকা মাঠে অস্থায়ী মঞ্চ করে আলকাপ নাট্যের আসরের ব্যবস্থা করে। যদিও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আলকাপ নাট্য উপস্থাপনায় অনেক আধুনিক বিষয়াদি যুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে পোশাক, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং বিষয়বস্তুতে। বক্ষ্যমাণ গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণকৃত আলকাপ নাট্যের পরিবেশনার ভিত্তিতে নিম্নে পরিবেশনারীতি উল্লেখ করা হলো।[৩৫]

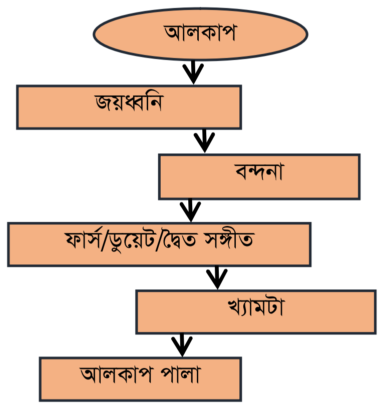

চিত্র ০২: আলকাপ নাট্যের পরিবেশনারীতি

আলকাপ নাট্য শুরু হওয়ার পূর্বে বাদ্যযন্ত্রী দল যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে কনসার্ট করতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, যন্ত্রশিল্পীগণ নিজ নিজ বাদ্যে স্ব স্ব সুর তোলেন। সেই সুর কখনো দ্রুত লয়ে আবার কখনও ধীর লয়ে বাজিয়ে থাকেন। সুরের এই অংশটুকুকে স্থানীয় ভাষায় গদ বলা হয়। প্রচলিত অর্থে যাকে কনসার্ট বলা হচ্ছে স্থানীয়ভাবে তাকে গদ বলা হচ্ছে। কনসার্ট বা গদের পরেই শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেয়া শুরু করে। এই ধ্বনি সাধারণত সঙ্গীতের মহান সাধক মিয়া তানসেন, দলের সরকার, দেবী সরস্বতী এবং গণেশ প্রমুখের নামে।[৩৬]

এরপর আসর বন্দনা শুরু হয়। মূলত দলের সরকার আসর বন্দনা পরিবেশন করে থাকেন। বন্দনায় মূলত শিব, সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা, কার্তিক ইত্যাদি হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনা করা হয়। আলকাপ নাট্যের অনেক আসরে লক্ষ করা যায় আসর বন্দনার পরে দ্যাশ বন্দনা করা হয়। দ্যাশ বন্দনায় দেশের বর্ণনাসহ দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য যে, আসর বন্দনায় দলের সরকার মুসলিম সম্প্রদায়ের হলেও হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে বন্দনা উপস্থাপন করতে কোনো প্রকার সংকোচবোধ করেন না। এতে করে আলকাপ শিল্পীদের অসাম্প্রদায়িক মানুষিকতার দৃঢ়তা বোঝা যায়।[৩৭]

বন্দনার পরেই শুরু হয় খ্যামটা। আলকাপ নাট্যের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হলো খ্যামটা। ডুয়েট বা আলকাপ পালা শুরু হওয়ার পূর্বে খ্যামটার মাধ্যমে আগত দর্শকদের অধিক পরিমাণে বিনোদিত এবং মনোযোগী করা হয়। খ্যামটার শুরুতে বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা যন্ত্রে সুর তোলেন আর সেই সুর অনুসরণ করে ছোকড়া নৃত্য শুরু করেন। খ্যামটার গান ও নৃত্য দর্শকদের পুলকিত করে তোলে। খ্যামটায় অধিকাংশ সময়েই ঐ সময়ের প্রচলিত আধুনিক এবং জনপ্রিয় সিনেমার গান ব্যবহার করা হয়।[৩৮]

খ্যামটার পর পরিবেশিত হয় ফার্স বা দ্বৈত সঙ্গীত। ফার্সকে ডুয়েট হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। স্থানীয় শিল্পীরা বেশিরভাগই ফার্সকে ডুয়েট নামে আখ্যায়িত করে থাকে। এক আসরে দুই বা ততোধিক ফার্স গান পরিবেশিত হয়। ফার্স গানের মূল বিষয় প্রেম। যেখানে আদি-রস অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের আধিক্য বেশি থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথন এ গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ফার্স গানের পর শুরু হয় অভিনয়সমৃদ্ধ আলকাপ পালা। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা বিষয় নিয়ে আলকাপ পালার কাহিনি পরিবেশিত হয়ে থাকে। আলকাপের উৎস লৌকিক জীবন থেকে, কোনো আরোপিত চিন্তা চেতনা আলকাপ পালার পরিবেশনায় নাই। এজন্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন ও লৌকিক সমাজের মানুষের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ মানবিক সম্পর্ক আলকাপকে অনন্য লোকশিক্ষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছে।

আলকাপ নাট্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয় সমাজে উদ্ভূত নানা প্রকার সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে। এ নাট্য পরিবেশনার জন্য যে সামাজিক সমস্যা বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হয় সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের মতে, 'সামাজিক সমস্যা' একটি চিরন্তন এবং আপেক্ষিক বিষয়। প্রতিটি সমাজেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। মধ্যযুগের সমাজে এক ধরনের সমস্যা আবার উত্তর-আধুনিক সমাজে ভিন্নতর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে দরিদ্র, অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক সমস্যা থেকে উন্নত দেশের সামাজিক সমস্যা আলাদা। কিন্তু 'সমস্যামুক্ত সমাজ' নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান একটি দেশ। এখানে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর প্রভাব পড়ছে সমাজে। দেখা যাচ্ছে নানাবিধ নতুন নতুন সমস্যা। তবে চিরায়ত বাংলাদেশে দীর্ঘকালের কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যা থেকে এখনো সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি। যেমনঃ মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, ইভটিজিং, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, গ্রামীণ সমাজে চড়া সুদের ব্যবসা, স্বাস্থ্য অসচেতনতা, পারিবারিক বৈষম্য প্রভৃতি। আলকাপ নাট্যের মাধ্যমে উক্ত সামাজিক সমস্যাগুলোর ক্ষতিকর দিক এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হাস্যরসাত্মকভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

আলকাপ নাট্য ক্রমাগত সামাজিক অসামঞ্জস্য, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কেননা আলকাপ নাট্যের সকল শিল্পীই নিম্নবর্গের হয়ে থাকে। তারা নিজেদের চেতনাগত জায়গা থেকেই সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, শ্রেণি বৈষম্য, উচ্চবর্গের অধিপত্য এবং পারিবারিক কলহ ও সামাজিক সম্প্রতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলকাপ নাট্য পরিবেশন করে থাকে। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপের আসরে যেসব পালা পরিবেশন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম পালাগুলো হলো– 'রসে ভরা বিয়াই-বিহান', 'যৌতুক', 'এসো আমার বাড়ি এসো', 'মাটি কাটা', 'কানাই-শংকর' 'ছেলে-বাবা', 'শ্বাশুড়ি-বউ', 'ননদ পূজা', 'ব্রাহ্মণের পূজা', 'রাজা হরিশচন্দ্রের আলকাপ', 'গোলাবাজ মেলার আলকাপ', 'লক্ষীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি', 'সতী নারীর বনবাস', 'সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী', 'চাষা-ভদ্র', 'ডোম-ধোপা', 'চামার-কামার', 'হিন্দু-মুসলমান', 'রাধা-কৃষ্ণ', 'গৌষ্ঠ-বৃন্দা', 'দেওর-ভাবি', 'বড় ভাই-ছোট ভাই', 'আপন-দুলাল', 'নেশা খোর' ইত্যাদি।

নওগাঁ জেলার অন্তর্গত নিয়ামতপুর উপজেলার সাদাপুর খড়িবাড়ি এলাকায় পরিবেশিত আলকাপ নাট্য *সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী* পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বন্দনা ও খ্যামটা নৃত্যের পরেই বড় ভাই (কাইপ্যা) উপস্থিত হয় দর্শকের উদ্দেশ্যে এক প্রকার সচেতনামূলক ভাষণ নিয়ে। যে ভাষণের মূল বক্তব্য হলো মাদকদ্রব্য গ্রহণ অর্থাৎ নেশা করা থেকে বিরত থাকা।

> ভাষণ...
> আপনারা, কেউ নেশা খাবেন না বিক্রি করবেন না
> নেশা খেলে অর্থের ক্ষতি নিজের দেহের ক্ষতি
> নেশা খাওয়ার জন্য পরিবারে অশান্তি শুরু হয় অনেক ঝামেলা হয়।
> আর শোনেন, যদি আপনারা কেউ নেশা খান আর আমি যদি ধরতে পারি তাহলে ৩ মাসের জেল ১০ হাজার টাকা জরিমানা। তাই আপনারা কেউ নেশা খায়েন না কাউকে খাইতেও দিয়েন না।[৩৯]

বড় ভাই (কাইপ্যা) গ্রামে মাদকদ্রব্য বন্ধে নোটিশ জারি এবং সবাইকে সচেতন করছেন। গ্রামে যারা যারা মাদক অর্থাৎ নেশা গ্রহণ করে তাদের প্রত্যেককে ধরে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তার পূর্বে পুরো গ্রামে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে আজ থেকে গ্রামে সকল প্রকার মাদক বন্ধ। গ্রামে মাদক বন্ধে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সাথে আলোচনায় যুক্ত হয়। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে এ গ্রামে যারা যারা নেশা খায় তাদের সবাইকে যেনো ধরে নিয়ে আসে। কারণ বড় ভাই হলো প্রশাসনের লোক তিনি একজন ডিবি। তখন ছোট ভাই বলে, "আমিও তো নেশা করি তাহলে এখন কি উপায় হবে?"[৪০] যেহেতু

'কাইপ্যা' দৈহিক অঙ্গভঙ্গি ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ দিয়ে দর্শক সাধারণকে হাসিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে ছোট ভাই উল্লেখ করে যে, সে যদি নেশা না খায় তাহলে অন্য নেশা খোরদের ধরবে কিভাবে। তবে সে অবশ্যই নেশা আর গ্রহণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিড়ি বা সিগারেটও আর গ্রহণ করবে না। ছোট ভাই মূলত আইনের ভয় পেয়ে নেশা গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে এবং নেশা বন্ধে সে সহযোগিতাও করবে।

বড় ভাইঃ তুমি একটা, কাজ করো দাদা।
ছোট ভাইঃ কী কাজ?
বড় ভাইঃ তুমি একটু এলাকায় সবাইকে জানিয়ে দেও নেশা মাদক সব বন্ধ আজ থেকে।
ছোট ভাইঃ ঠিক আছে দাদা
বড় ভাইঃ সাবধান তুমি যাই করো ওদের ধরে তোমাকেই আনতে হবে।
ছোট ভাইঃ হুম, আমি যাই করি ওদের ধরে আনতেই হবে।
বড় ভাইঃ আচ্ছা শোনো... তোমাকে ধরে আনতে হবে না, তুমি আগে গ্রামের সবাইকে জানিয়ে দাও কেউ যাতে নেশা না খায়, না বেঁচে।[৪১]

হাস্যরসাত্মক নানা সংলাপ এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে চরিত্রদ্বয় অভিনয় প্রদর্শন করে। সাধারণ দর্শকের সাথে অভিনেতারা মিশে যায়। জীবন ঘনিষ্ঠ সংলাপ প্রদানের মাধ্যমে অভিনেতারা দর্শকদের সচেতন করেন। দর্শকরাও নানা মজাদার প্রশ্ন করার মাধ্যমে সমাধান জেনে নেয় অভিনেতাদের কাছ থেকে। পর্যবেক্ষণকৃত এ পালায় দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীকে কিছু গয়না দেয় দোকানে বিক্রি করতে। কারণ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী থেকে টাকা উত্তোলন করেছে সেখানে কিস্তি দিতে হবে। স্বামী সেই গয়নাগুলো দোকানে নিয়ে বিক্রি করে। বাজার থেকে বাড়িতে আসার সময় তার বন্ধুর সাথে দেখা হয় তাকে নিয়ে সে নেশা খেতে চলে যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত নেশা খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফেরে। গয়না বিক্রির প্রায় সব টাকা দিয়েই সে নেশা জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করেছে। কিস্তি দিতে না পেরে এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা প্রবন্ধের জন্য উক্ত পালাটি পর্যবেক্ষণে লক্ষ করা যায়, উল্লিখিত সংলাপের পুরো আয়োজনটি ছিলো অংশগ্রহণমূলক।[৪২] মাদক প্রতিকার বিষয়ে আলকাপ নাট্য *সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী* পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের বিনোদন দেয়ার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও সৃষ্টি করে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাদক হচ্ছে এমন একটি দ্রব্য যা সেবন করলে মানুষের স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন হয় এবং এসব দ্রব্য সামগ্রী মস্তিকের বিকৃতি ঘটায়। বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। সমাজে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করাকে সব সময়ই নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়। জনসাধারণকে সচেতন করতেই মাদকের প্রতিকার নিয়ে আলকাপ গান প্রদর্শন করা হয়।

উল্লিখিত আলকাপ নাট্যের অভিনয়ে দেখা যায়, সমাজে সকলের মাঝে সচেতনার জন্যই উল্লিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ নাট্য পরিবেশন করা হয়েছে। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হলে অবশ্যই মাদকদ্রব্যের প্রাপ্তি সহজলভ্য যাতে না হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা।

আলকাপ নাট্য গ্রামীণ সমাজ, সমাজ জীবন এবং সমাজে বসবাসরত মানুষের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে রচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ গ্রাম্যগাঁথা, উপকাহিনি এবং সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে পরিবেশিত হয়। বর্তমান সময়ে আলকাপ নাট্যে শুধু সমাজের চিত্র বা সমাজের মানুষকে রূপায়িত করা হয় না বরং যুগের চিন্তা, যুগের সমস্যা এবং লোকশিক্ষাকেও চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়। হাস্যরস ও সুরের কলা কৌশল এবং নাটকীয়তার সংমিশ্রণে আলকাপ গান গাওয়া হয়। ঊনিশ শতকে আলকাপ নাট্যে যে সব অংশের অধিক গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তা ছিলো, সময়ের ব্যবধানে তার কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। বিত্তবান শ্রেণির অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ সময়ে আলকাপ নাট্যে ধর্মীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ অভিনয় অংশের প্রাধান্য হ্রাস পায়।[৪৩] অন্য দিকে এতে খ্যামটা ও ফার্স আলোচনা বিতর্কসমৃদ্ধ অভিনয় অংশের প্রাধান্যও ঘটে। আলকাপ নাট্যের উপজীব্য বিষয় হিসেবে মুসলিম ঐতিহ্য, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, একই সাথে শিল্পীদের নিজস্ব অস্তিত্বের লড়াইয়ে সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তুসমূহ স্থান করে নিয়েছে। সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু হিসেবে নারী-পুরুষের বৈষম্য, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন, সমাজের নানা-অসঙ্গতি, ধনী-গরিবের ব্যবধান, মহাজনের চড়া সুদ ও এর নেতিবাচক প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলো আলকাপ নাট্যে লক্ষ করা যায়।[৪৪]

ঊনিশ শতকে আলকাপ গানে যে সব অংশের অধিক গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তা ছিলো, সময়ের ব্যবধানে তার কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। ধনিক শ্রেণির অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ সময়ে আলকাপ গানের ধর্মীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ অভিনয় অংশের প্রাধান্য হ্রাস পায়। অন্য দিকে এতে খ্যামটা ও ফার্স আলোচনা বিতর্কসমৃদ্ধ অভিনয় অংশের প্রাধান্যও ঘটে। আলকাপ গানের উপজীব্য বিষয়

হিসেবে মুসলিম ঐতিহ্য, হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, একই সাথে শিল্পীদের নিজস্ব অস্তিত্বের লড়াইয়ে সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তুসমূহ স্থান করে নিয়েছে। সমকালীন সামাজিক বিষয়বস্তু হিসেবে নারী-পুরুষের বৈষম্য, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন, শিক্ষার গুরুত্ব, সমাজের নানা-অসঙ্গতি, মাদকদ্রব্য, ইভটিজিং, ধনী-গরিবের ব্যবধান, মহাজনের চড়া সুদ ও এর নেতিবাচক প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলো আলকাপ নাট্যে লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

সময়ের আবর্তনে গ্রামীণ সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতা, সৃজনশীল কল্পনা, রীতিনীতি, অতীত ও বর্তমানের পরম্পরায় এক সুষমামণ্ডিত নান্দনিক বার্তা-বিনিময় ঘটে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা, শিল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। কেননা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি সমাজ সম্পৃক্ত বিষয়। বলা যায়, সমাজের চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক এদেশের ঐহিত্যবাহী নাট্য যার অন্যতম উদাহরণ সঙ ও আলকাপ। এ নাট্যাঙ্গিকদ্বয় মানুষের সুখ-দুঃখ, বিনোদন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি ও সুন্দর সমাজ গঠনের প্রত্যয়েই সঙ ও আলকাপ নাট্যের বিষয়বস্তুতে সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে আনা হয়। সমাজ শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব নিয়েই ধর্ম, সমাজ এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতি সম্পর্কে নিরক্ষর জনগণের কাছে শিক্ষার বিস্তার ঘটায় এ নাট্যাঙ্গিকদ্বয়। ধর্মকে অবলম্বন করে সঙ ও আলকাপ সৃষ্টি হয়েছিলো সত্য, কিন্তু ধর্মকে উত্তরণ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দেশের ক্ষয়-ক্ষতি ও তার সমাধান মিলেছে এ ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকদ্বয়ে মধ্য দিয়ে। মিলেছে সমাজ জীবনের সত্য ও অসত্য সম্পর্কে শিক্ষা ও কর্তব্যবুদ্ধির উপদেশ। সঙ ও আলকাপের শিল্পীরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী নন বটে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো নীতি বা তত্ত্বের উদ্ভাবকও নন তাঁরা, কিন্তু জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে সমাধানের পথ নির্দেশ করায় প্রকৃত জনশিক্ষকের মর্যাদায় আজো তাঁরা অভিষিক্ত। এ নাট্যাঙ্গিক দুটি আবহমান বাংলার নিজস্ব ধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়ে কালে কালে বাঙালির রসপিপাসুচিত্তের মন্ময় আনন্দ এবং প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে তুলেছে।

সঙ ও আলকাপ ইতিহাসের ধারায় বিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে সামাজিক অসামঞ্জস্য, অনাচার, অবিচারের কথাগুলোই উপস্থাপন করে যাচ্ছে। এ কারণে বলা হয়, সঙ ও আলকাপ নাট্য ক্রমাগত সামাজিক অসামঞ্জস্য, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সঙ ও আলকাপ নাট্যের উপস্থাপনা বিপুলভাবে সমকাল ও সমাজনির্ভর বিধায় হাজার বছরের বাংলা নাট্যের বিচারে অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের চেয়ে এর উপস্থাপনাশৈলী ভিন্নতর। এ নাট্যদ্বয়ের বিষয় ও অভিনয়শৈলী বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিল্পরসপিপাসু চিত্তকে বিনোদিত করে চলছে বিধায় আজও সম্প্রতিকালের শিল্পরূপে বিবেচ্য এই বাংলা নাট্যরীতি সঙ ও আলকাপ।

ঐতিহ্যবাহী নাট্যের মধ্যে সঙ ও আলকাপ শক্তিশালী এক মাধ্যম। পরিবেশের লৌকিক সমাজ, হাটবাটের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চা ও লোকসমাজের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ মানবিক সম্পর্ক সঙ ও আলকাপ নাট্যকে অনন্য লোকশিক্ষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছে। শ্রেণি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা অবিচার শোষণ আর্থিক দীনতা-লাম্পট্য-উদারতা-সাধুতা এবং সর্বোপরি জনমানসের প্রতিবাদী ধ্যান-ধারণা এ নাট্যদ্বয়কে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সাধারণ মানুষ এই নাট্যাঙ্গিকদ্বয়ে যেমন বিনোদনের ব্যাপক খোরাক পেয়েছেন, তেমনি গ্রামীণ মানুষ লোকশিক্ষায় উদ্দীপিত হয়েছেন, পথ চলার ইন্ধন পেয়েছেন এবং সামাজিক নানা সঙ্কট থেকে উত্তরণের সন্ধান পেয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মোহাম্মদ সাইদুর, "বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য", সৈকত আসগর সম্পা., *লোকনাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৩৪।

২ নরেন বিশ্বাস, *বাঙলা উচ্চারণ অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১) পৃ. ৪৫৫।

৩ স্বপন বক্সী, "সঙের সেকাল-একাল" *কলকাতা পুরশ্রী*, ৪র্থ সংখ্যা, ৯ম বর্ষ, ২০০৯, পৃ. ২০।

৪ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে* (কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২), পৃ. ০২।

৫ *তদেব*, পৃ. ০৩।

৬ *তদেব*।

৭ সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ২৮।

৮ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, পৃ. ০৩।

৯ *তদেব*, পৃ. ০৮।

১০ *তদেব*।

১১ "সমাজ, সামাজিক" শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু নকল করা অর্থে এই শব্দ হইতে উদ্ভূত নানা শব্দ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে পাওয়া যায়। রুশ নাট্যকার, বাদ্যকার, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও ভাবাবিৎ Herssim (Gerssim) Lebedeff হেরাসিম লেবেদেফ খ্রীষ্ট্রীয় আঠারো শতকের শেষ দশকে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বাঙালি নাট্যকার ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে

সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ধরণে দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি সহিত নাটক অভিনয় করান, বাঙালা ভাষায়। ইংরেজি হইতে দুইখানি নাটক তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করান। একখানির ইংরেজি নাম The Disguise, বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করা হয় 'সঙ-বদল' অর্থাৎ 'পরিচ্ছেদের পরিবর্তন'-যাত্রা নাটকে যে বিভিন্ন পরিচ্ছদ অভিনেতৃবর্গ পরিয়া থাকেন, তাহারই পরিবর্তন-অর্থাৎ Disguise এখনাকার বাঙ্গালায় আমরা বলিব "ছদ্মবেশ"।{অধ্যাপক সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংযোজন}বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, পৃ. ০৪।

১২ অতুন মিত্র, "বাংলার সঙ-এ অশ্লীলতার রঙ্গরস", Dr. Rina Pal Chief Editor, *Anudhyan An International Journal of Social Sciences (AIJSS)*, Volume 3, No 1, August 2018 P. 75.

১৩ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ২৮।

১৪ সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২১), পৃ. ৪৫৯।

১৫ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, পৃ. ২২।

১৬ আফসার আহমদ, "ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্য সঙঃ বিষয় ও শিল্পের অনুষঙ্গে সমাজ বাস্তবতা", *থিয়েটার স্টাডিজ*, ১৬ তম সংখ্যা, জুন ২০০৯, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭ ভিডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, ভজন পাল, পরিচালক, *মহাদেব সঙযাত্রা দল*, ২৯ নভেম্বর ২০২৩, রাত ৯.৪০ টা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৮ *তদেব*।

১৯ শামসুজ্জামান খান প্রধান সম্পা. *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা টাঙ্গাইল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২০), পৃ. ৪১১।

২০ ভিডিওতে ধারণকৃত নাট্য, *ট্যাবার বিয়ে*, ২৯ নভেম্বর ২০২৩, রাত ৮.০০ টা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২১ *তদেব*।

২২ জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি: ১৯৯০), পৃ. ৯৭।

২৩ মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত: আলকাপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১০৮।

২৪ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২), পৃ. ৫৫৫।

২৫ মহ: নুরুল ইসলাম, *আলকাপ* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১), পৃ. ০১।

২৬ *তদেব*, পৃ. ৩৩।

২৭ মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত: আলকাপ*, পৃ. ৪৬।

২৮ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পা., *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* (কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৭), পৃ. ৩৮১।

২৯ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২), পৃ. ১৩২।

৩০ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক ভিডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক আবুল হাসান চৌধুরী, ১৬ মে ২০২০, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩১ মহসিন আহমেদ, "লোকসাহিত্য: আলকাপ", *নবাবগঞ্জ সাময়িকী*, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জানুয়ারী ১৯৬৪, পৃ. ২৭।

৩২ পুলকেন্দু সিংহ, "মুর্শিদাবাদের আলকাপ গান", *কর্ণসুবর্ণ পত্রিকা*, শারদীয় সংখ্যা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৫, পৃ. ২৯।

৩৩ মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসংগীত: আলকাপ*, পৃ. ১১১।

৩৪ *তদেব*, পৃ. ১১৯।

৩৫ ভিডিওতে ধারণকৃত নাট্য, *আলকাপ গান-সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী*, ১২ নভেম্বর ২০২১, রাত ৮.০০ টা, সাদাপুর খড়িবাবাড়ি, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

৩৬ ভিডিওতে ধারণকৃত নাট্য, *ছোট ভাই ভেজাল*, ০৬ অক্টোবর ২০২২, দুপুর ২ টা, রমজান পাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

৩৭ *তদেব*।

৩৮ *তদেব*।

৩৯ ভিডিওতে ধারণকৃত নাট্য, *আলকাপ গান-সংসার ধ্বংসের কারণ মাতাল স্বামী*, ১২ নভেম্বর ২০২১, রাত ৮.০০ টা, সাদাপুর খড়িবাবাড়ি, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

৪০ *তদেব*।

৪১ *তদেব*।

৪২ *তদেব*।

৪৩ ড. আলীম আল রাজী, *আলকাপ ও গম্ভীরা গানে উচ্চবর্গের মতাদর্শিক আধিপত্য ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ* (পিএইচডি গবেষণা, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত)

৪৪ *তদেব*।